দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ও দু'টি প্রস্তাবনা

অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ ভূঞা

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রাইমারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী গরীব ও দুঃস্থ পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার প্রতি আগ্রাহান্বিত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যেমন– প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা, অবহেলিত গ্রামগুলোতে রেজিস্টার্ড প্রাইমারী বিদ্যালয় গড়া, পুরাতন, ভগ্ন ও বিশ্বস্ত স্কুলগুলির পুনঃ নির্মাণ করা, শিক্ষার পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ও উপকরণাদি সরবরাহ করা, নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ, স্যাটালাইট স্কুল স্থাপন করা, সর্বোপরি শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট ঘোষণা করার মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বৃটিশ-ভারত-পাকিস্তান আমলসহ ইতিপূর্বে সরকারগুলোর সবক'টি সরকারই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বিলম্ব করে আসছিলো। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কোন নীতিমালা ও সঠিক পাঠ্যসূচী কিংবা উন্নয়নমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করেনি। দেশে জনসংখ্যার হার জ্যামেতিক হারে বাড়লেও শিক্ষিতের হার গাণিতিক হারে কমে চলছে। অথচ শিক্ষিতের হার বাড়ানোর কোন মৌলিক প্রচেষ্টাই ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা যায়নি। মনে রাখা দরকার, অশিক্ষিত জনসমাজ দিয়ে উন্নততর সমাজ গঠন কিংবা দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব নয়। তাই লক্ষ্য করা যায়, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো ছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষিতের হার বাড়িয়ে শিক্ষিত সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে, আশার কথা এই যে, সরকারের সম্প্রতি সিদ্ধান্তে সে হাওয়া আমাদের দেশেও বইতে শুরু করলো। কার্যতঃ দেশের গণতান্ত্রিক সরকারই জনগণের সুশিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে পেরেছেন। আর পেরেছেন বলেই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী মেধাবী, দুস্থ ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য নিজের বেতনের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়েছেন। নিয়েছেন "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার" মত একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই গ্রাম বাছাই করে লক্ষাধিক টন খাদ্য এই খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সেখানে এই রিতিটি এখন থেকে বহু দিন আগে Denmark-এ চালু হয়। সেখানে Peoples High নামে বিদ্যালয় গড়ে তাতে বিশ বছর বয়সের উর্ধ্বের লোকদের ৩ থেকে ৫ মাসব্যাপী খাদ্যের বিনিময়ে নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষরতা শিক্ষার এই কর্মসূচীটি বহাল ছিল। তাদের মতে, কোন জাতির সমস্ত জীবন চর্চার নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবিকা সংগ্রহে নিপুণতা লাভ, ভদ্র মানুষ, সুন্দর সমাজ সৃষ্টি করা, সুস্থ, সুখী ও কুশলী মানুষ গড়া, কর্তব্য-কর্মের যোগ্য করে তোলা, সামাজিক সচেতনতা ও সক্রিয়তা সৃষ্টি করা, সুনাগরিক সৃষ্টি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি প্রজ্ঞাবান করা এবং সর্বশেষে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে গড়া।

টি. এইচ. হাক্সলীর একটা মন্তব্য প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরছি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, "নবজাতক শিশু মেথর কিংবা দোকানী অথবা বিশপ কিংবা ডিউক হয়ে পৃথিবীতে পদার্পন করে না, প্রতিটি নবজাতক শিশুই জন্মকালে একরকম দেখতে হয়, লাল একটি রক্ত-মাংশের পিন্ড। আমরা প্রত্যেককে যথাযথ শিক্ষাদান করলেই শুধু এদের যথার্থ যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি।" দেশে সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর ১০০ এবং নিম্নশ্রেণী থেকে ১০০ লোক বেছে নিলে তাদের ভিতরে যোগ্যতার কোন তারতম্য থাকবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তার এ বিশ্বাসে আমরাও একমত। কারণ, দীপশিখা তেমন প্রদীপের সমস্ত বাতীটুকু প্রকাশ করে– শিক্ষাও তেমনি একটি জাতির বহিঃপ্রকৃতির সার্বিক পরিচয় দিয়ে থাকে। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষা জীবনধারার বহির্ভূত কোন বস্তু নয়। জীবনে যখন সংঘাত আসে, অভ্যস্ত জীবনের চিরপরিচিত পথ যখন অবরুদ্ধ হয়, সমস্যার কণ্ঠকে তখন মানুষ তার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়িয়ে ধরে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কোন বিষয়ে কতগুলো তথ্য সংগ্রহ বা স্মৃতির সাহায্যে তা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে উদগীরণ করা নয়। এর উদ্দেশ্য মানুষের সুপ্ত বৈশিষ্ট্যকে পুনরুজ্জীবিত করা। এর জন্যই এর প্রাথমিক অবস্থায় দরকার ভিত মজবুত করে বেঁচে থাকার উপায় নির্ধারণ করা। আর বেঁচে থাকতে হলে চাই, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তি না করতে পারলে তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে না। তাই যে দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে তাদের দরিদ্রতা আংশিক হলেও দূরীকরণ অত্যাবশ্যক। যে দেশের ছিন্নমূল সন্তানেরা কাকডাকা ভোরে কর্মের সন্ধানে বের হয়ে কঠিন পাথর ভাঙ্গতে হাতুড়ী হাতে রাস্তায় নামে। ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় রিক্সা, বাসে ও বড় লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে বেড়ায়। আশা ও নৈরাশ্যে দিন কাটে। বুভুক্ষু অবস্থায় নিশিযাপন ঘটে– তাদের হাতে বই তুলে দিতে হলে আগে চাই খাদ্যের নিশ্চয়তা।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী হয়তো এ দিকটা বিবেচনা করেই "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা" কর্মসূচী গ্রহণে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ধরনের কর্মসূচীতে অভাবগ্রস্ত পিতা-মাতার সন্তানের শিক্ষার পথ সুগম হবে সঙ্গে সঙ্গে অভাবও মোচন হবে। শিক্ষার্থীর লাভ দু'দিকেই। নিয়মিত খাবার পাওয়া গেলো আবার সুশিক্ষিত হওয়ার নিশ্চয়তাও মিলল।

উপরোক্ত কথাগুলো যেমন সত্য তেমনি আমরা এটাও মনে করি, বিদেশী ঋণের বোঝাই যে দেশের উন্নয়নের সোপান সে দেশে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ এবং চালু রাখাও তেমনি কঠিন কাজ। তবে এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতা নেয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। বিত্তবানদের বিত্ত নিতান্তই সাধারণ লোকের উপকারে আসতে পারে। উদ্যোগ থাকলে ধনকে অসহায়জনের কাজে লাগানো যায়। যেমন দেখা যায় মিসরে। সেখানে সরকার আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে ও বিত্তবানদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন।

আমেরিকাতে শিক্ষার জন্য Federal Grants বৃদ্ধি করা হয়। কোন কোন দেশ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা উন্নয়ন তহবিল গঠন করে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণ দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করে। আমাদের দেশেও তা আছে তবে বিদেশী ঋণের সঙ্গে দেশী বিত্তবানেরা সহযোগিতাও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাব এই যে, ধনীদেরকে এ ব্যাপারে পুরুস্কার ও খেতাব দানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারী এলোকেশনও পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো উচিত। প্রয়োজনবোধে নতুন শিক্ষাকর ধার্য করা অথবা ধনী ব্যক্তিদের নিকট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এমনকি বিদ্যালয় নির্মাণের ব্যাপারে সরকারী ঋণ দান প্রথাও চালু করা যেতে পারে।

আরো একটি প্রস্তাব ঃ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা" কর্মসূচীকে আরো অর্থবহ ও সার্থক করে তোলা যাবে যদি দেশের অল্পশিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত বেকারদের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষকতা কর্মসূচীও গ্রহণ করা যায় তাহলে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশ অনেকটা মুক্ত হতো। তার জন্য গড়ে তুলতে হবে এমন কিছু বিদ্যায়তন যেখানে বেকারেরা খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। তাহলে একই কর্মসূচীতে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা এবং শিক্ষকতা দু'টোই চলবে। শিক্ষিত বেকার এবং অশিক্ষিত গরীব সন্তান উভয়েই উপকৃত হবে। নেপোলিয়নের মত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠিন নিগড়ে বেঁধে না রেখে প্রুশীয়দের মত জ্ঞান বিস্তারকে রাষ্ট্রের কল্যাণে, জাতীয় উন্নয়নে ও জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং শিক্ষিতের হার বাড়বে।